চারাগুলো মাঠ জুড়ে পাখা ছড়ায়, তখনই একদিন পাখি লজ্জায় শামুক হয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে জানায়– তাদের দু'বছরের নিষ্ফলা দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটতে চলেছে। নতুন অতিথির আগমন সম্ভাবনায় পাগল হয়ে ওঠে একামতউল্লাহ। পাখির তলপেটে কান লাগিয়ে কী এক প্রত্যাশিত ধ্বনি শুনতে চেষ্টা করে। অতোটা প্রাথমিক অবস্থায় কিছুই শোনার কথা নয়। তবু মনে হয়, সে শুনতে পাচ্ছে, কী এক বিচিত্র ধ্বনি তার কানের দরজায় কড়া নাড়ছে। সেই ধ্বনি কানের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। পরদিন মাঠে গিয়ে নিড়ানি হাতে ধানের জমিতে বসতেই আবার সেই ধ্বনি শুনতে পায়। সারা শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। কান খাড়া করে। মৃদু বাতাসে দুলে উঠছে কচি ধানের সবুজ পাতা। স্নেহার্দ্র হাতে সে সবুজ পাতার বুকে বিলি কাটে, পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেয়, তখনই আবার শুনতে পায় সেই বিচিত্র ধ্বনি। কেমন এক নেশার ঘোর লেগে যায় একামতউল্লাহর মগজের কোষে কোষে। বাড়ি ফিরে আবার পাখির তলপেটে কান পাতে।

প্রত্যাশিত ধ্বনি শুনতে পায় কিনা সেই জানে, দু'হাতে জাপটে ধরে পাখির সারা শরীর। কখনো হাত বুলায় বুকে পিঠে, কখনো বা তার চুলের অরণ্যে বিলি কাটে মমতার চিরুনি হয়ে।

একামতউল্লাহ ক্রমশ বুকের নদীতে ভাঙন টের পায়। কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সব কিছু। চারপাশের চেনাজানা অনেক কিছুতেই অচেনা কোনো রঙের ছোঁয়া। ভেতরে ভেতরে কিসের যেন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। পাখির শরীরে হাত রাখলেই সবুজ ধানের স্পর্শ মেলে। মাঠে গিয়ে ধানের জমিতে নামলেই পাখির কথা মনে পড়ে যায়। ভীষণ এক ঘোরের মধ্যে কাটে তার দিনরাত। সবুজ পাতার বুক চিরে সবেমাত্র ধানের শীষ ছড়িয়েছে। মমতার স্পর্শে নুইয়ে আনে সেই শীষ। দুই আঙুলের পেষণে একটি ধানের পাতলা আবরণ আলগা হয়ে যায়। বেরিয়ে আসে ধবল সাদা দুধ। অবাক বিস্ময়ে আঙুলের ডগায় লেগে থাকা দুধ পরখ করে। লোভী বালকের মতো জিভে ছুঁয়ে স্বাদ নেয়। মাটি তার বুকের সুধা নিংড়ে গাছের শরীর বেয়ে কী ভাবে যে এই অসাধারণ সঞ্চয় পৌঁছে দেয় ভেবে পায় না একামতউল্লাহ। বাড়ি ফিরে রাতে সে কথা জিজ্ঞেস করে পাখিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে পাখি। কথা বলে না। একামতউল্লাহর ডান হাতের পাঁচ আঙুল তখন পাখির শরীরে তন্নতন্ন করে সন্ধান করে ঐ প্রশ্নের জবাব। গত দু'বছরের চেনা অচেনা সকল অলিগলি সন্ধান করে। পাখির বুকের উপত্যকায় এসে থেমে পড়ে তার সন্ধানী হাত। টিয়ের ঠোঁট হয়ে দু'আঙুলে কুটুস করে চিমটি কাটে পাখির স্তনবৃন্তে। পরম পুলকে পাখির মুখ থেকে একবার শুধু উচ্চারিত হয় উহ্।

একামতউল্লাহ তখনই অনুভব করে কচি ধানের ধবল দুধে ভিজে গেছে তার আঙুলের ডগা। পাখিকে নয়, সে যেন তার বুকের বাসরে ধারণ করেছে পিতৃবর্ণিত তাবৎ হারানো জমি।

# তিমা

দ্বিতীয়

## সানিয়াত সাত্তার

'বিশ্ব নারী দিবসে আজকের এই বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হবেন আমাদের সকলের অতি প্রিয় মুখ তিমা রহমান...'

এভাবে অনুষ্ঠান ঘোষিকার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে অতি লাজুক তিমার লজ্জা যেন আরো গাঢ় হচ্ছিল। কিন্তু সেই লজ্জার অভিব্যক্তি যথাযথ হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও তিমা যথেষ্ট সন্দিহান।

ফুলের তোড়া, ক্রেস্ট, মডেল আর অফুরন্ত করতালির জোয়ারে যেন তিমার ডুবে যাওয়ার দশা! কাঁধ ফিরিয়ে পাশে বসা মহিলা নেত্রী মিসেস জামিলা আহমেদকে তিমা বললো, 'আপা। একটু যদি পানির ব্যবস্থা...' মিসেস জামিলা করতালির ছন্দে এতটাই তন্ময় ছিলেন যে, তিমার কথাগুলো তার কানে পৌঁছালো না। তিমা উত্তর না পেয়ে আবারো বললো 'আপা। পানি।' সামনের সারিতে বসা একজন দর্শকের ব্যাপারটা চোখে পড়লো। তিনি অকেকটা চিৎকার করেই বললেন, 'এই যে জামিলা ম্যাডাম! তিমা আপা আপনাকে কি যেন বলছেন। দয়া করে উনার কথাটা শুনেন।' দর্শকের চিৎকারে মিসেস জামিলা যেন করতালির জগৎ থেকে বাস্তবতায় ফিরে এলেন।

'তুমি কি কিছু বলছো তিমা?'

'হ্যাঁ আপা, আমাকে এক গ্লাস পানি দিলে বড় কৃতার্থ হবো।'

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়। সবশেষে সংবর্ধিত তিমা রহমান দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবে। তিমা আস্তে করে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মিসেস জামিলা বললেন, 'উহু, দাঁড়াতে হবে না। তুমি এখানে বসেই বলো।' তিমা মিসেস জামিলার কথা অগ্রাহ্য করে মঞ্চের এক কোনায় দাঁড় করানো পোডিয়ামের কাছে গেল। একজন লোক এসে মাইক্রোফোনটা তিমার সমান উচ্চতায় এনে ঠিক করে দিল। তিমা তার চোখের কালো চশমাটা সরিয়ে নিলো। পুরো মিলনায়তন জুড়ে পিনপতন নীরবতা। সবাই যেন এই মুহূর্তটার জন্যেই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

দুই ভাই তিন বোনের মধ্যে আমি হচ্ছি তৃতীয়। আমি যেদিন নিম্ন মধ্যবিত্ত এই পরিবারে জন্মালাম, সেদিন নাকি ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার– অমাবশ্যা। জন্ম থেকে অন্ধকার আমার পথ চলার সাথী। তিমির আঁধারের সাথে মিলিয়ে আমার নামটা রাখা হলো 'তিমা'। সবাই বলতো আমি নাকি আমার সব ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ফর্সা। কিন্তু আমার এই ফর্সা চেহারাটা আমি কখনো দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কী, ফর্সা কাকে বলে, আলো কাকে বলে... তা'ই আমি জানি না। কিন্তু আলো বা রঙের একেকটা আলাদা চেহারা আমার মনের ভেতর তৈরি করা আছে। আমি ভাবি নীল মানে এই, আর লাল মানে ওই। হয়তো আমার মতো যারা জন্মান্ধ, যারা কখনো রঙ দেখেনি... তারা প্রত্যেকেই এরকম একেকটা ছবি তৈরি করে আপন মনে।

ভাই-বোন কাউকে কখনো চোখে না দেখলেও ওদের ভীষণ ভালোবাসা আমি সব সময় অনুভব করতে পারতাম। ওদের প্রত্যেকের গায়ের গন্ধও ছিল আলাদা। আমি দূর থেকে গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারতাম যে, ভাইয়া আসছে বা কলিমণি দৌড়াচ্ছে। আমার এরকম অদ্ভুত ক্ষমতায় পাড়ার সবাই আমায় বলতো, 'মহিলা দরবেশ'! আমার বড় আপা ভীষণ ভালো গান গাইতে পারতো। মা গান-বাজনা খুব একটা পছন্দ না করলেও বাবার আগ্রহে বড় আপা গানের ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করলো। আপা যখন গান গাইতো তখন আমি আমাদের খোলা বারান্দায় তন্ময় হয়ে আপার গান শুনতাম। আর আমিও মাঝে মাঝে গুনগুন করতাম, 'আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা...' একদিন আপা আমার গুনগুনানি শুনে ফেললো, 'কীরে তিমা? তুইতো সাংঘাতিক ট্যালেন্ট রে! এত সুন্দর করে গান করিস? দাঁড়া, বাবাকে বলবো তোকেও একটা ওস্তাদজী রেখে দিতে।' কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমার সারা শরীরে হঠাৎ একটা শিহরণ বয়ে গেল।

সন্ধ্যে বেলায় সব ভাই বোন পড়তে বসতো। অবশ্য আমি ছাড়া। সবাই যখন পড়তো, সেসময় আমি খোলা বারান্দায় ছোট একটা টুলে বসে মশাদের গান শুনতাম। আমার কেন যেন মনে হতো, মশারাও আপার ঐ 'আলোর' গানটা গাইছে। হঠাৎ তাত্তুটা চীৎকার করে উঠতো, 'তিমা'পা! অ্যাঁই তিমা'পা!! চার তেরং কতরে?'

'বায়ান্ন।'

'তিমা'পা! ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল ইংরেজি কি?'

'জানি না। অমন বাজে ইংরেজি করার কোনো মানে হয়, যেখানে ডাক্তার সময়মতো পৌঁছাতে পারে না?'

আমার কথা শুনে পাশের ঘর থেকে মা খুব বকা লাগাতো, 'আহারে আমার পন্ডিত মেয়ে! কাজ-কর্ম না থাকলে দয়া করে চুপ কর। ওদের পড়তে দে শান্তিতে।' মায়ের কথায় আমি খুব ব্যথা পেতাম। কিন্তু কিছু লতাম না। কারণ অহোরাত্র কষ্টকর কথা হজম করে ওটাই আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

আমি কখনোই বই পুস্তক হাতে নেইনি। আর নিলেও কোনো লাভ নেই। স্বরে 'অ' দেখতে কেমন বা হ্রস্ব 'ই' লিখতে কেমন, তাতো বলার ক্ষমতা আমার নেই। তারপরও আপা-ভাইয়া আর ছোটদের যাবতীয় পড়াগুলো যেন আমি শুনেই আয়ত্ত করে পেলতাম। আমারও খুব ইচ্ছে করতো পড়তে, স্কুরে যেতে। কিন্তু সেটাতো কখনোই সম্ভব নয়।

আপা হাজারো অনুনয় করে বাবাকে আমার গান চর্চার বিষয়ে রাজি করাতে পারলো না। বাবার কথা হলো যে, তিনি রক্ত জল করে যে পয়সা উপার্জন করছেন তাতে আমার মতো অন্ধ মেয়ের 'সারেগামা' করাটা নেহায়েত বাহুল্য ছাড়া কিছুই নয়।

আপার ইন্টারমিডিয়েট পাস করার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। এর আগে অবশ্য আপার আরও দুই জায়াগায় বিয়ের কথা ঠিক ছিল। কিন্তু একজন জন্মান্ধ বোনের অস্তিত্বের কারণে ওরা আমার লক্ষী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সুস্থ বোনটাকেও

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

খুঁতওয়ালা ভেবে বিয়ে ভেঙে দেয়। এসব কারণে এবার আপার বিয়ের আগে ভাগেই আমাকে দূরের এক ফুফুর বাসায় রেখে আসা হলো, যেমন কোনো উটকো ঝামেলা না বাধে। আপার বিয়ের অল্প কিছুদিনের মাথায় বড় ভাইয়া চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গেল। যাওয়ার আগে ভাইয়া আমার সাথে ফুপুর বাসায় দেখা করতে এলো। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে ভাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদলো, 'তোর মত একটা শান্ত লক্ষী বোন আছে আমার, এটা আমার জন্য যে কত বড় পাওয়া তুই জানিস না। কখনো মন খারাপ করবি না। তাত্তু ওর এসএসসি পরীক্ষাটার পরই এসে তোকে বাসায় নিয়ে যাবে। কখনো মাথা নিচু করে চলবি না। তুই যা দেখিস, আমরা তা দেখতে পাই না। তুই যা শুনিস, আমরা তা শুনতে পাই না। জীবনে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখবি সব সময়। দেখবি একদিন সেই আলোতেই চারদিক আলোকিত হবে।'

আমি প্রায় প্রতিদিন আমার ফুপাতো বোন রুনুকে দিয়ে বাসায় তাত্তুর পরীক্ষার খোঁজ-খবর জানতে চিঠি লিখতাম। জানি না সেই চিঠি আদৌ বাসায় পৌঁছাতো কি না! আমি একদিন দুদিন করে অপেক্ষা করতাম, কবে তাত্তুর পরীক্ষা শেষ হবে আর কবে আমি বাসায় যাবো... আমার মা-বাবার কাছে যাবো। কিন্তু বাসায় আমার আর কখনোই যাওয়া হলো না।

আমি যে ফুফুর বাসায় থাকতাম তিনি আমায় বড্ড ভালোবাসতেন। তিনি আমার নামের পাশে সবসময় একটা 'সোনা' বসাতেন। প্রথম প্রথম তার ভালোবাসা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হতো, কেননা বড়দের ভালোবাসার সাথে আমি সেভাবে কখনোই অভ্যস্ত ছিলাম না। একদিন 'মশা গুনগুন' সন্ধ্যায় যখন আপার কথা খুব মনে হচ্ছিল, তখন আস্তে করে গাইছিলাম আপার সেই 'আলোর' গানটা আর চোখের সামনে সৃষ্টি করলাম কতগুলো রঙের একটা অবয়ব যেটাকে আমি সেই ছোটবেলা থেকে 'আপা' হিসেবে কল্পনা করে আসছি। আমার গাল বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো। জানি না কেন, নিজের জীবনটার প্রতি একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা তৈরি হলো। দয়া করে কেউ যদি আমায় একটু ভালোবাসে তবেই যেন আমি সুন্দর জীবন পাব। আমার নিজের পথ চলার কোনো উপায় নেই। আমার অসহায়ত্বই যেন আমার একমাত্র অবলম্বন। আমার কণ্ঠে 'আলোর' গানটা কখন যে কান্নায় পরিণত হলো, টেরই পাইনি। ফুফু পেছন থেকে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওকি সোনা? কান্না কেন তিমা সোনা? তোমার তো ভারি মিষ্টি গলা। দাঁড়াও, কালই একটা ব্যবস্থা করছি।' পরদিন ফুপু আমার জন্য যে ব্যবস্থাটা করলেন তাতে আমার পুরো জীবনটাই অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি আমাকে এক সঙ্গীত স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শুরু হলো আমার সঙ্গীত জগতে নতুন জীবন।

আমি যখন কণ্ঠে সুর তুলতাম, তখন চোখের সামনে তৈরি করতাম অনেক রঙের ছবি। একেকটা গানের জন্য একেকটা ছবি। আর ছবিগুলো গানের সুরে সুরে চেহারা বদলাতো। অন্ধ বলেই হোক, বা কণ্ঠের জন্যেই হোক, অল্প দিনেই আমার খুব নাম হয়ে গেল। ব্যস্ততাও বেড়ে গেল অনেক। আজ অমুক জায়গায় রেকর্ডিং, তো কাল প্লেব্যাক। অনেক দিন পর যেদিন আপার সাথে দেখা হলো, সেদিন আপা আমায় জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না, 'আমি যা করতে পারিনি তুই তা পেরেছিস। আমি জানতাম তুই পারবি।' আপা বার বার এই কথাগুলোই বলছিল। ভাইয়া আমাকে সুদূর বিলেত থেকে একটা বিলেতি গিটার পাঠিয়েছে, যেটা আমি বাজাতে না পারলেও স্পর্শ করে ভাইয়ার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। তাত্তু এখন মস্তবড় অফিসার। সে থাকে খুলনায়। আর কলিমণির খুব শিগগির বিয়ে। কিন্তু মজার কথাটা হলো, এবার আমার বাবা-মা কলিমনির বিয়েতে আমাকে অবশ্যই থাকতে বলেছে। বলেছে আমি না গেলে নাকি বিয়ের পুরো অনুষ্ঠানই পন্ড! আমার বাবা-মা এখন গর্ব করে বলে যে তারা তিমা রহমানের বাবা-মা!

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে অনেক আগেই। তারপরও সাংবাদিকরা যেন তিমা রহমানের পিছু ছাড়ছেই না। 'কিছু মনে করবেন না আপা, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি। আপনার মতো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অথচ এতো জনপ্রিয় একজন শিল্পীকে অনেকেই কর্নিয়া সংযোজনের মাধ্যমে চোখের আলো ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। আপনি ব্যাপারটি কিভাবে...'

'... দেখছি, তাইতো জানতে চাচ্ছেন? আমি তো ভাই দেখতেই পাই না। দেখতে চাইও না। হতে পারে পৃথিবীটা অনেক আলোকিত, অনেক সুন্দর। কিন্তু আমার আলো হচ্ছে আমার ছোট ছোট আশাগুলো। যেগুলোর আমি রঙিন অবয়ব দিই। আশাই আমার অন্ধকার ভুবনটাকে আলোকিত করেছে। আমি অন্য কোনো আলোর ভুবনে যেতে চাই না। চাই না।'

# দ্বিতীয় জীবন

তৃতীয়

## তৈয়বুর রহমান

মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বেঁচে থাকাটা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে গেল। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় কাটিয়ে দেয়ার পর আমার মনে প্রথমবারের মতো প্রশ্ন জাগলো কেন বেঁচে আছি। অনেক ভেবে জবাব পেলাম, আসলে বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই, কোনো অর্থ নেই। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি মরে গেলেও কিছুই আসতো-যেতো না। আজ থেকে ত্রিশ বছর পর মরলেও কিছু আসবে-যাবে না। বেঁচে থাকাটা খুব একটা খারাপ কিছু নয় আবার খুব একটা ভালো কিছুও নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকাটা তাই অর্থহীন। তবে মরে যাওয়াটা কেমন সেটা এখনও জানি না, তাই সেটা জানতেই বড় ইচ্ছা করছে। সম্ভবত সেটা বেঁচে থাকার মতো এতোটা একঘেয়ে জিনিস হবে না। তাই সব দিক ভেবেচিন্তে মরে যাওয়াটাকেই আমার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো।

এতোসব দার্শনিক কথার আসলে কোনো মানে নেই। আমার মরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নেই। খুব সহজ সরল কারণ। আমার মা দুদিন আগে মারা গেছেন। কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই সুস্থ মানুষটি দুম করে মরে গেলো। তার দু সপ্তাহ আগে আমার অনেক কষ্টে জোগাড় করা প্রাইভেট ফার্মের চাকরিটি চলে গেছে। এটাও কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই দুম করে চলে গেল। আর আজকে আমার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে না, বলা যায় হয়ে গেছে। এতোক্ষণে বোধহয় কবুল-টবুল বলা শেষ, গেস্টরা সবাই ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি যাচ্ছে। আমারও দাওয়াত ছিলো। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর একদিন পরই নিজের প্রেমিকার বিয়ের দাওয়াত খাওয়াটা ঠিক হবে কিনা সেটা বুঝতে পারছিলাম না বলে আর যাওয়া হলো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটাও একদম দুম করে হয়ে গেলো। আমার প্রেমিকাটি একদিন চোখ মুছতে মুছতে আমাকে বললো...ধুর, কি জানি কি বললো ঠিক মনে নেই। তবে খুব কেঁদেছিলো, এটা মনে আছে।

সবগুলো ঘটনা কেমন যেন সিনেমার মতো পরপর ঘটে গেলো। ওই যে অনেক সিনেমাতে যেমন শুরুর দশ-পনেরো মিনিটে নায়কের ছোটবেলার ঘটনাগুলো পরপর দ্রুত ঘটে যায়। ভিলেনের গুলি খেয়ে নায়কের বাবা-মা সবাই মারা যায়। নায়কের ভাই-টাই থাকলে একজন থেকে আরেকজন আলাদা হয়ে যায়, তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে নায়ক বড় হয়ে যায়। এবং তারপর পুরো ছবিতে নায়ক শুধু নায়িকার সঙ্গে গান গায় আর একের পর এক ভিলেনকে কুপোকাত করতে থাকে। আমার ঘটনাগুলোও এমন দ্রুত ঘটে গেলো। কিন্তু আমার গল্পের ভিলেনটি যে কে, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হতে পারে আমার নিয়তি। আমার পুরো বাসা এখন খালি। মা ছাড়া পৃথিবীতে আমার তেমন কেউ ছিলো না। মা মারা যাওয়ার পর যে দু'একজন সান্ত্বনা দিতে এসেছিল তারাও দায়িত্ব পালন করে চলে গেছে। আমি ভূতের মতো নিজের খালি বাসায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। গতকালই বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ জোগাড় করেছি। জোগাড় করতে বেশ ঝামেলা হয়েছে। দোকানিরা ঘুমের ওষুধ চাইলেই কেমন যেন সরু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। আমি কি করতে যাচ্ছি তা কি সবাই বুঝে ফেললো নাকি? এখন সত্যি আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি। আমার কষ্ট পাওয়ার আর কোনো কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে তাই একটা ঘুম দিলাম। শেষ ঘুম ঘুমানোর আগের একটি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত ঘুম।

খুব সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। রাতে জানালার পর্দা ঠিকমতো টেনে দেয়া হয়নি। পর্দার ফাঁক গলে এক চিলতে আলো এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। ভোরের প্রথম আলো এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। আমার জন্য হয়তো এটাই শেষ আলো। এটাই যখন শেষ আলো, তখন একে আর আসতে বাধা দিয়ে লাভ কি? আমি উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম। এবার আর এক চিলতে নয়, একরাশ আলো এসে আমাকে মিষ্টি পরশ বুলিয়ে দিল। ভোরের আলো তো, তাই মোটেও ঝগড়াটে নয়, ভীষণ আদুরে। আমার হঠাৎ করেই ইচ্ছে হলো আরো একটি দিন অন্তত বেঁচে থাকতে। একটা দিন বেশি বাঁচলে নতুন কিছুই হবে না জানি, তারপরও হঠাৎ কেন যেন এই অর্থহীন ইচ্ছেটা হলো।

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS